বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২৩৩-২৩৮
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

দক্ষিণ-পশ্চিম জলাবদ্ধ উপকূলীয় অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থা

বাবুর আলী গোলদার*

মূল শব্দ *জোয়ার-ভাটার প্লাবনভূমি, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, স্থায়ী জলাবদ্ধতা, কৃষক অভ্যুত্থান, স্থায়ী, দারিদ্র্য, ভূমিহীন, দুর্নীতি, নারী-শিশু পাচার, এলআর ফকাস, জোয়ারাধার/টিআরএম মডেল, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প*

ভূমিকা

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল বলতে যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলকে বোঝানো হচ্ছে। একসময় জাতীয় আয়ের সিংহভাগ জোগান দিত এই দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল। শুধু তা-ই নয়, এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক প্রাচুর্যও ছিল। গোয়ালভরা গরু, গোলাভরা ধান ও পুকুরভরা মাছ ছিল। এটা ছিল জোয়ার-ভাটার প্লাবনভূমি অঞ্চল। মানুষ বিল কমিটি গঠন করে অষ্টমেসে বাঁধ দিয়ে আউশ-আমন ফসল ফলাত। রবিশস্যও চাষাবাদ হতো। মাছ-ভাতের কোনো অভাব ছিল না। এলাকার পরিবেশ-প্রতিবেশ বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা না করে ৬০-এর দশকে সবুজ বিপ্লবের নামে নেদারল্যান্ডস সরকারের প্রযুক্তি ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে শুরু করা হয় উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প। ১৫ বছর এর মধ্যে এ প্রকল্পের কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়। নদীর নাব্য হারিয়ে ৮০ দশকে শুরু হয় জলাবদ্ধতা। এবং ক্রমান্বয়ে জলাবদ্ধতা স্থায়ী রূপ ধারণ করতে থাকে। যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার ৮টি থানার ৬৮টি ইউনিয়নে প্রায় দেড় লক্ষ হেক্টর জমি জলাবদ্ধ হয় এবং ১২ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে লবণাক্ততাও জনজীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। আবার সিডর, আইলার মতো দুর্যোগ তো প্রায়ই এ অঞ্চলে প্রতিবছর লেগেই আছে। এর মধ্যে আবার এ অঞ্চলে ২০টি অন্ত্যজ শ্রেণির জনগোষ্ঠী বসবাস করে। যা, মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৮ শতাংশ। এরা সর্বদিক দিয়ে অবহেলিত ও দরিদ্র্য, ভূমিহীন, সামাজিক মর্যাদাও এদের কম।

* পরিচালক, পাঁজিয়া সমাজকল্যাণ সংস্থা; ফোন: ০১৭১১২৭৯৫১৮ ই-মেইল:baburpsks@yahoo.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু-দর্শন ও মানব উন্নয়ন" শীর্ষক খুলনা আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত, ২৩ নভেম্বর ২০১৯

জলাবদ্ধতা নিরসনে সরকার গৃহীত পদক্ষেপ

এরশাদ সরকারের আমল থেকে জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে নদ-নদীর উপর ক্রস বাঁধ দিয়ে ডজন ডজনবার নদীখনন করা হয়। এতে কোনো ফল হয়নি। বরং জলাবদ্ধতা আরও বিস্তার লাভ করে এবং প্রকল্পের অর্থ লুটপাট হয়। এখনো খনন করা হচ্ছে। খনন করে মাটি নদ-নদীর মধ্যেই রাখা হচ্ছে। ভরত ভায়না বিলের টিআরএম মডেল সরকার গ্রহণ করেছিল। বিল কেদারিয়ায় ও কেশবপুরের পূর্ব বিলখুশিয়ায় টিআরএম প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছিল। আংশিক ফলাফলও অর্জিত হয়েছিল। এলাকার জনগণ জলাবদ্ধতা নিরসনে টিআরএম এর বিকল্প নেই—এ কথা বলছে।

জলাবদ্ধতা নিরসনে আন্দোলন সংগ্রাম ও গণ-উদ্যোগ

জলাবদ্ধতা সমস্যা এত প্রকট যে এ জনপদ যেন আন্দোলন-সংগ্রামের এক জলন্ত দৃষ্টান্ত। জলাবদ্ধতা নিরসন আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন ক্ষেত্রমোহন মাস্টার, গোবিন্দ মাস্টার, পঙ্গু হয়েছেন সরওয়ার মাস্টার ও গোবিন্দ সরকার। নিহত হন পুলিশ কনস্টেবল মোশারফ। বামপন্থী দলগুলোকে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে দেখা যায় বেশি। ১৯৮৮ সালের ২২ জুলাই কেশবপুরের ডহুরি নামক স্থানে ১০ হাজার জনগণের এক কৃষক অভ্যুত্থান হয়। যে অভ্যুত্থানে ক্ষেত্রমোহন বাদে উল্লিখিত ব্যক্তিরা শহীদ হন। ১৯৯০ সালের ১৮ সেপ্টম্বর বিল ডাকাতিয়া সংগ্রাম কমিটি ১৪৪ ধরা ভঙ্গ করে জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বাঁধ কেটে দেয়। ১৯৯২ সালে পাঁজিয়া-পাথরা বিলের বাঁধ কেটে দেয় জনগণ। ১৯৯৭ সালের ২৯ অক্টোবর কেশবপুরের ভরত ভায়না বিলের বাঁধ কেটে দেয় জনগণ। বাঁধ কাটার দায়ে ১০০ জনের নামে মামলা হয়। পরবর্তী সময়ে সিইজিআইএস ও পানি উন্নয়ন বোর্ড বাঁধ কাটাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করে। এবং উদ্ভব হয় জোয়ারাধার/টিআরএম। যা এখন পৃথিবীর মডেল। টিআরএম এর ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু এখন সরকার জলাবদ্ধতা নিরসনে টিআরএম প্রকল্প থেকে সরে আসছে। কিন্তু এখনো জলাবদ্ধতা নিরসনে আন্দোলন-সংগ্রামে কমিটিগুলো কাজ করে যাচ্ছে। যেমন ভবদহ পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটি, কপোতাক্ষ বাঁচাও আন্দোলন, ভবদহ পানি নিষ্কাশন আন্দোলন কমিটি, পানি কমিটিসহ আরও অনেক। যা হোক এই জলাবদ্ধতা দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর কী প্রভাব ফেলছে নিচে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. **মৎস্য ঘের:** ৮০-এর দশক থেকে বিলগুলো জলাবদ্ধ। সমস্যা সমাধানে মানুষ সরকারের মুখাপেক্ষী থেকেছে, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। অবশেষে মানুষ কম্যুনিটি মৎস্য ঘেরের সৃষ্টি করে। উদ্দেশ্য শুধু মৎস্য চাষ নয়। পানি পাম্প আউট করে ধান চাষ। কিন্তু পুঁজি, প্রযুক্তি, নেতৃত্ব ও দুর্নীতির কারণে কম্যুনিটি ঘেরের উদ্যোগ টেকেনি। পরবর্তী সময়ে শর্তসাপেক্ষ ঘেরগুলো লিজ দেওয়া হয়। বাইরের লোক এসে লিজ নেয়। বোরো মৌসুমে পানি পাম্প আউট করে চাষাবাদের উপযোগী করে দেওয়ার শর্তে। কোনোবার লিজগ্রহীতা চুক্তিপত্রের শর্ত মানেন, কোনো বছর মানেন না। ঘের দখল নিয়ে অনেক দুর্ঘটনা ও হামলা-মামলার সৃষ্টি হয়। ভূমিহীন ব্যক্তিরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। ঘেরের মধ্যে হাঁস চরে বেড়াতে পারে না। গোখাদ্য সংগ্রহ করা যায় না। সঙ্গত কারণেই মানুষ অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়।

২. **কর্মসংস্থান:** জলাবদ্ধতার কারণে এলাকায় কর্মসংস্থান থাকে না। মানুষ শহর অঞ্চলে রিকশা-ভ্যান চালাতে যায়। এমনকি সন্তানাদি বাড়ি রেখে স্বামি-স্ত্রী রাতে কাজ করতে শিল্পাঞ্চলে যায়। কর্মসংস্থান না থাকলে আর্থিক সংকটের মুখে পড়তে হয় প্রতিনিয়ত।

৩. **দারিদ্র্য:** দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে জলাবদ্ধ এলাকার মানুষ বেশি দরিদ্র।

৪. **স্বাস্থ্য:** জলাবদ্ধতা যখন প্রকট আকার ধারণ করে, তখন কলেরা-ডায়েরিয়া-আমাশয় ও চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। উন্নত চিকিৎসা করার সামর্থ্য তাদের থাকে না। জলাবদ্ধ এলাকার অধিকাংশ মানুষ পুষ্টিহীনতার চরম শিকার।

৫. **শিক্ষা:** জলাবদ্ধতার সময় অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। ফলে শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হয়। যোগাযোগব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে।

৬. **শিশু ও নারী পাচার:** জলাবদ্ধতার কারণে তীব্র দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয় এবং কর্মসংস্থান থাকে না। ফলে এলাকার টাউট-দালালেরা কাজের প্রোলোভন দেখিয়ে নারী ও শিশুদের বিদেশে পাচার করে দেয়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী উপজেলাসমূহে নারী-শিশু পাচারের সংখ্যা বেশি।

৭. **মাইগ্রেশন:** সিজনাল মাইগ্রেশন হয় বেশি। কারণ, স্থানীয় লোকজন কাজের সন্ধানে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কাজ করতে যায় এবং অনেকে দেশ ছেড়েও চলে যান।

৮. **পরিবেশদূষণ:** জলাবদ্ধতার কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হয়ে যায়। আর যার ফলে এলাকায় বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি দেখা দেয়। আবার অন্যদিকে যেহেতু জলাবদ্ধ এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে একটি বোরো ফসল হয়, সেহেতু প্রচুর রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ফসলে ব্যবহার করার ফলে পরিবেশদূষণ হয়। ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানীর সমস্যা বাড়ছে। জরিপ করলে হয়তো বা দেখা যাবে যশোর অঞ্চলে ক্যানসার ও হৃদ্‌রোগীর সংখ্যা বেশি। এক জরিপে দেখা গেছে যে, প্রতিবছর ২৯ হাজার টন বিষ ব্যবহার করা হয় বাংলাদেশে। এমন হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিষ ব্যবহারের পরিমাণ আরও বেশি। আর ভূগর্ভের পানি উত্তোলনের ফলে যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে ধানের চালে আর্সেনিকের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। আর্সেনিকোসিস রোগীও আছে এই এলাকায়। সব মিলিয়ে অর্থনৈতিক সংকট প্রকট। প্রকাশ থাকে যে, পরিবেশদূষণে বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বছরে ১২ হাজার কোটি টাকা। (প্রথম আলো ১৭.০৯.২০১৯)।

৯. **কৃষি ও আর্থসামাজিক অবস্থা:** আমাদের এ অঞ্চলের জনগণ আদিকাল থেকেই এলাকার ভূ-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনপ্রণালী ও চাষাবাদ পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল। লবণাক্ততা ও বন্যা সহনশীল ধানের চাষাবাদ করতেন। এবং প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যেতো। এ অঞ্চলে কোনো খাদ্যঘাটতি ছিল না। ১৯০৮ সালে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের বার্ষিক বাজেট সম্পর্কে একটা ধারণার জন্য ১৯২০-২৬ সাল পর্যন্ত একটা অনুসন্ধান জরিপ চালানো হয়। এলআর ফকাস (1920-26 L. R. Fowcus) তাঁর (Final Report on the survey and statement operation in the district of Khulna)-তে পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক ও একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক সমন্বয়ে একটা প্রান্তিক চাষি পরিবারের বার্ষিক বাজেট ৫৫০.০০ ছিল বলে বর্ণনা করেছেন। এ রিপোর্ট থেকে সেই সময়ে এ অঞ্চলের মানুষের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। এরপর আর তেমন কোনো জরিপ হয়েছে বলে জানা নেই। তবে ১৯৮১ সালে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার ১০০ পরিবারের ওপর একটি জরিপ চালানো হয়। এতে দেখা যায় দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা ৫৫%, নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রায় ৩৭%, বাকি ৮% মধ্যবিত্ত। কোনো গ্রামেই উচ্চ মধ্যবিত্ত ও ধনী পাওয়া যায়নি। দরিদ্র পরিবারের বার্ষিক সর্বোচ্চ আয় ৩,৬০০.০০ টাকা। (মুহম্মদ নুরুল ইসলাম 'খুলনা জেলা' পৃ. ৪২১)।

১০. **যোগাযোগব্যবস্থা:** জলাবদ্ধতা-বন্যার কারণে যোগাযোগব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। কাঁচা রাস্তা-পাকা রাস্তা সবই যাতায়াতের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বেড়ে যায়। আবার জলাবদ্ধ এলাকায় যে সমস্ত ভারী জিনিসপত্র রয়েছে সেগুলোর দামও কমে যায়। কোনো রোগীকে জরুরি মুহূর্তে হাসপাতালে নেওয়াও দুরূহ হয়ে পড়ে। আর আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি তো আছেই। ২০০৪ সালের বন্যায় যশোর জেলার মোট আয়তনের ৭৭ দশমিক ৯০ শতাংশ এলাকাই প্লাবিত হয়েছিল।

১১. **বসতবাড়ি:** গ্রামাঞ্চলের জনগণের কাঁচা ঘরবাড়ি একবারে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ ও মেরামত করতে আর্থিক সংকটের মুখে পড়তে হয়।

১২. **জ্বালানির সংকট:** পূর্বে এ এলাকায় জ্বালানি কোনো সংকট ছিল না। যশোরের খেজুরের গুড় ছিল বিখ্যাত। কিন্তু সেই যশোরে এখন খেজুরের গুড় তেমন উৎপাদন হয় না। কারণ, স্থায়ী জলাবদ্ধতায় অনেক খেজুরগাছ মারা গেছে এবং এতে করে জ্বালানি সংকটও বেড়েছে। জলাবদ্ধতার আগে প্রচুর জ্বালানি ছিল। যেমন ধানের খড়, আগাছা, গাছগাছালি, গাছের ঝরাপাতা ইত্যাদি। এসব আগে তেমন ক্রয় করতে হতো না। জ্বালানিসংকটের কারণে এখন গ্রামের গরিব মানুষেরাও রান্নার কাজে গ্যাস ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। এটা করতে গিয়ে তাদের আর্থিক সংকটের মুখে পড়তে হচ্ছে।

১৩. **ফ্যামিলি ডাইভারশন:** বাঙালি সংস্কৃতি হলো যৌথপরিবারে বসবাসের সংস্কৃতি। জলাবদ্ধতার কারণে সে সংস্কৃতি এখন আর নেই। দেখা যাচ্ছে বাবা বাইরের জেলায় কাজ করতে গেছেন, মা কোনো এক রাইস মিলে, চিংড়ি কারখানা বা শহরের কোনো বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করছেন। মেয়ে হয়তো বা গ্রামের কারও বাড়িতে কাজ করছেন। এই হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা।

১৪. **পেশার পরিবর্তন:** এ লাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কৃষক। কিন্তু জলাবদ্ধতার কারণে কেউ শ্রমিক শ্রেণিতে, ভ্যান-রিকশাচালক বা অন্য পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

১৫. **নারীশ্রমিক:** জলাবদ্ধ এলাকায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তাদের মজুরিও বেশ কম।

১৬. **খাসজমি:** দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে অনেক খাসজমি ও নদীর চর রয়েছে, যা ভূমিহীনদের প্রাপ্য। কিন্তু ধনিক শ্রেণি তা দখল করে বসে আছে। এমনকি সাতক্ষীরা জেলায় খাসজমির জন্য লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হন জায়েদা নামে এক নারী। আরও অনেক লোক আহত হন। অনেক ভূমিহীনকে মামলা-মোকদ্দমাও সহ্য করতে হচ্ছে।

১৭. **সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড:** জলাবদ্ধ এলাকায় শত শত নোনা ও মিষ্টি পানির মৎস্য ঘেরের সৃষ্টি হয়েছে, যা নিয়ন্ত্রণ করে প্রভাবশালী ও শহরের ক্ষমতাসীন লোকেরা। এতে অনেক আমলাও জড়িত থাকেন। সন্ত্রাসী বাহিনী দ্বারা ঘের পরিচালিত হয়। জমির মালিকেরা তাদের ন্যায্য হিস্যা বুঝে পান না। ফলে ঘের দখল, জমি দখলকে কেন্দ্র করে অনেক মামলা মোকদ্দমা ও খুন, হত্যা ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে।

১৮. **ঋণগ্রস্ততা:** দারিদ্র্যের কষাঘাতের কারণে এলাকার অধিকাংশ মানুষ কোনো না কোনো এনজিওর নিকট থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করছেন। এমনকি খোজখবর নিয়ে দেখা গেছে অধিকাংশ শিক্ষকই ব্যাংকের কাছে ঋণী।

১৯. **লবণাক্ততা:** বাংলাদেশে মোট চাষযোগ্য জমির ৩০ শতাংশেরও বেশি হলো উপকূলীয় অঞ্চলে। বাংলাদেশে ৬৪টি জেলার মধ্যে ১৯টি জেলায় কমবেশি লবণাক্ততার সন্ধান পাওয়া গেছে। সাতক্ষীরা জেলায় লবণাক্ত মাটির পরিমাণ সর্বাধিক, প্রায় ১ লাখ ৪৭ হাজার হেক্টর। এই লবণাক্ততা আরও বাড়ছে প্রতিবছর। ক্রমান্বয়ে লবণাক্ততা উত্তরাঞ্চলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক অবস্থা হুমকির মুখে পড়ছে। গবেষকেরা বলছেন, লবণাক্ততার কারণে উদ্বাস্তু হবে মানুষ। (প্রথম আলো, ৩ নভেম্বর ২০১৮)। উপকূল অঞ্চলে ২০% গর্ভপাতের কারণ লবণাক্ততা (বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন প্র. আ. ২৬ আগস্ট ২০১৯)।

২০. **গো-খাদ্য সংকট:** আশির দশকের আগে তেমন গোখাদ্যের প্রয়োজন হতো না। গবাদিপশু বিলে চরে বেড়াত দিনের বেলায়। সন্ধ্যার আগে মাঠে ঘাস-পাতা খেয়ে পেট পুরে গোয়াল ঘরে ফিরত। আর এখন এক কাহন খড়বিচালি ক্রয় করতে হচ্ছে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকায়। ছোট ১ আঁটি ঘাস ক্রয় করতে হয় ১৫ থেকে ২০ টাকায়। কেশবপুরের বাগডাঙ্গা গ্রামে কিছু গরুর বাচ্চা পঙ্গু হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জানান, মূলত অপুষ্টির কারণেই গরুর বাচ্চা বিকলাঙ্গ হচ্ছে। বাগডাঙ্গা গ্রামটির দুই পাশে জলাবদ্ধ বিল। গরুকে কচুরিপনা খাওয়ানো হতো গো-খাদ্য সংকটের কারণে।

২১. **ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য:** ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য অতি মাত্রায় বাড়ছে। উপকূলীয় অঞ্চল এর বাইরে নয়। এখন আর চীন বিশ্বের অতি ধনীর তালিকায় নেই। এখন বাংলাদেশ। বাংলাদেশে ধনী লোকের সংখ্যা ১৭.৩%। আর চীন ১৩.৪%, ভারত ১০.৭%, পাকিস্তান ৮.৪%, যুক্তরাষ্ট্র ৮.১% (প্র. আ., ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮)।

২২. **নৈরাজ্য:** এ ছাড়াও লিজসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাধারণ সম্পত্তিসহ বিভিন্ন জমি-জলা সম্পত্তি দখল ও লুট, ছিনতাই, ডাকাতি, খুন, মাস্তানি ও নানা অপরাধের পেশাদারি তৎপরতা, উন্নয়ন বরাদ্দ, কাজের বিনিময় খাদ্য, উপবৃত্তি, দুস্থ মাতা কর্মসূচি, ত্রাণ তহবিল ইত্যাদি আত্মসাৎ, ভূমিসংক্রান্ত দুর্নীতি এবং ঘুষবাণিজ্য ইত্যাদি রয়েছে অহরহ।

২৩. **সংস্কৃতি চর্চায় ঘাটতি:** এ অঞ্চলে একসময় বিভিন্ন গ্রামে পালাগান, জারি-সারি, যাত্রা, মেলা, পুতুলনাচ প্রভৃতির আয়োজন হতো। এখন আর তেমন সেগুলো হতে দেখা যায় না।

পরিশেষে বলা যায়, দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধান ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে কিছু সুপারিশ নিম্নে উপস্থাপন করা হচ্ছে—

- সকল নদ-নদী অববাহিকায় একটি করে জোয়ারাধার (টিআরএম) কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- জোয়ারাধারকৃত বিলের জমি মালিকদেরকে সহজ শর্তে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।
- পদ্মা/ভৈরব/মাথাভাঙ্গা নদ-নদীর সাথে এ অঞ্চলের নদ-নদীগুলোর সংযোগ স্থাপন করতে হবে।
- প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততাকরণ নিশ্চিত করতে হবে।
- সমস্যা সমাধানে লোকজ জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে হবে।
- সব নদ-নদী দখল মুক্ত করতে হবে।

- সব খাসজমি চিহ্নিত করে ভূমিহীনদের দখলে দিতে হবে।
- সমস্যা সমাধানে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি গঠন করতে হবে।
- পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত প্রায় ১৪ হাজার ৯০০ কিলোমিটার এলাকাব্যাপী আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছে, যা বাস্তবায়িত হলে আমাদের দেশের ওপর প্রচণ্ড নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ২০০০ সালে ভারতের বন্যায় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। ভারতেও এ প্রকল্পের বিরুদ্ধে কথা উঠেছে।
- লোকজ জ্ঞানের সমন্বয়ে বিকল্প জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।